প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

গোলপাতা ও তালের নার্সারি উত্তোলন এবং বনায়ন কৌশল

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জুন, ২০২১

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

গোলপাতা ও তালের নার্সারি উত্তোলন এবং বনায়ন কৌশল

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জুন, ২০২১

প্রকাশকাল
জুন, ২০২১

প্রকাশক/ প্রকাশনায়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

গ্রন্থস্বত্ত্ব
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

রচনায়
ড. আ. স. ম. হেলাল উদ্দীন আহমেদ সিদ্দীকি
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
এবং
মোঃ গোলাম মাওলা
মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ

অর্থায়নে
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
বন অধিদপ্তর, বন ভবন
আগারগাঁও, ঢাকা।

মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ : তিশা এন্টারপ্রাইজ, ৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ০১৮১৯-২৯৯৪৩০।

সতর্কতা
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত, যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বই বা এর কোন অংশ, কোন ফর্ম বা কোন উপায়ে, ইলেক্ট্রনিক বা যান্ত্রিক মাধ্যমে, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা কোনও তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করা এবং পুনরুৎপাদন পদ্ধতি যা বর্তমানে জানা নেই বা যা ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে সহ যেকোন মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

বাণী

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্টস ল্যাবরেটরি" নামে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বিএফআরআই এর মূল লক্ষ্য হলো দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ ভোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ বন গবেষণ ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর আওতায় ১৭টি গবেষণা বিভাগ, ০১টি শাখা এবং ২২টি ফিল্ড স্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উন্নত জাত ও গুণগত মানসম্পন্ন প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন, বাঁশ, বেত, পাটিপাতা ও অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বনায়ন ও সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বৃক্ষ প্রজনন ও উন্নয়ন, বন ব্যবস্থাপনা ও বনবাগান উত্তোলন পদ্ধতি, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের ইনভেন্টরি, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হার নিরূপন, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনা, বনব্যাধি ও কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বনজ সম্পদের ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবহার এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সমূহ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ভোক্তা সংস্থাসহ ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিএফআরআই, বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের সাথে যৌথ ভাবে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি দেশের ২৮টি জেলার ১৬৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বিএফআরআই, বন অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। দেশের বনজ সম্পদের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের বন নির্ভর ভোক্তা গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে **"গোলপাতা ও তালের নার্সারি উত্তোলন এবং বনায়ন কৌশল"** বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য ভোক্তাগোষ্ঠীর কাজে সহায়ক ও জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করায় আমি সংশ্লিষ্ট গবেষণা বিভাগের গবেষকবৃন্দ এবং ম্যানুয়ালটির মুদ্রণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সুফল প্রকল্প, বন অধিদপ্তর এবং বিশ্ব ব্যাংক কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. রফিকুল হায়দার
পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায় ঃ গোলপাতার নার্সারি উত্তোলন ও বনায়ন কৌশল	
ভূমিকা	১
গোলপাতার পরিচিতি	১
গোলপাতার বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা	১
গোলপাতার ব্যবহার	৩
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গোলপাতার গুরুত্ব ও উপযোগিতা	৩
কৃত্রিম উপায়ে গোলপাতা চাষাবাদ	৪
চারা উত্তোলন পদ্ধতি	৪
গোলপাতার বাগান সৃজন	৭
গোলপাতা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	৯
উপসংহার	১০
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তালের নার্সারি উত্তোলন ও বনায়ন কৌশল	
ভূমিকা	১১
তালগাছের পরিচিতি	১১
তালগাছের গুরুত্ব	১১
তালগাছ কমে যাওয়ার কারণ	১৩
উপকূলীয় এলাকায় তালগাছ বনায়নের প্রয়োজনীয়তা	১৩
তালগাছ রোপণ ও পরিচর্যায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা	১৩
নার্সারিতে তালের চারা উত্তোলন পদ্ধতি	১৪
তালগাছ বনায়ন পদ্ধতি	১৭
উপকূলীয় এলাকায় তালগাছ বনায়নের খন্ড চিত্র	১৮
উপসংহার	১৯

প্রথম অধ্যায়

গোলপাতার নার্সারি উত্তোলন ও বনায়ন কৌশল

ভূমিকা

বন, বনভূমি ও বনজ সম্পদ মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে অপরিহার্য, যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে টেকসই বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা সর্বস্তরে সফলভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে গোলপাতা চাষ ও সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। "গরীবের ঢেউটিন" বলে পরিচিতি গোলপাতার বহুমুখী ব্যবহার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গোলপাতার পরিচিতি

গোলপাতা বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতি। Palmae পরিবারের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিটি প্রধানত উপকূলীয় জেলার বনাঞ্চলে নদী-খালের ধারে জন্মে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী-খাল বা নতুন চরে অধিক পরিমাণে গোলপাতা জন্মাতে দেখা যায়। গোলপাতার সর্বাধিক ব্যবহার মূলত এর পাতার অংশ বিশেষের জন্য। এর পাতা আসলে গোলাকার নয়, নামকরণের যথার্থতা অন্য ক্ষেত্রে নিহিত। সম্ভবত গোলাঘর বা গোলঘরে ব্যবহারের পাতা হিসেবে এ প্রজাতি অতি উৎকৃষ্ট ও উপযোগী বিধায় প্রজাতির নামকরণ হয়েছে গোলপাতা। গোলপাতা বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় পামি (Palmae) পরিবারভূক্ত উদ্ভিদ প্রজাতি। গোলপাতার বৈজ্ঞানিক নাম *Nypa fruticans*। গোলপাতার কান্ড বা রাইজোম মাটি হতে ৫০ সে.মি. উঁচু হয়। গোলগাছ সাধারণত ৩-৫ মিটার লম্বা হয় এবং দেখতে অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার মত। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্রই গোলপাতা জন্মাতে দেখা যায়। গোলপাতা প্রধানত নদী ও খাল ধারে ঝাড় আকারে বিন্যস্ত থাকে। একেক ঝাড়ে ১০-১৫টি পর্যন্ত স্টাম্প থাকে। রাইজোমের মাধ্যমে এক গাছ হতে অন্য গাছের বিস্তার ঘটে। প্রতিটি গাছে ৩-১০টি পর্যন্ত পাতা থাকে। নারিকেলের পাতার ন্যায় প্রতিটি পত্রে বিপরীতমুখী জোড়ায় জোড়ায় প্রায় ৬০-১২০টি পত্রক বা Leaflet থাকে। পাতা ২-৭মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং প্রায় ১.৫-২মিটার চওড়া হয়। বাংলাদেশের সুন্দরবন ছাড়াও খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন নিচু অঞ্চল, নদীর চর, ডোবা এবং খানা-খন্দে কম বেশি জন্মাতে দেখা যায়। প্রতি বছর সুন্দরবন হতে প্রায় ৭০,০০০ মেট্রিক টন গোলপাতা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে যা হতে সুন্দরবন বন বিভাগে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়। খুলনা অঞ্চল গোলপাতা সংগ্রহের জন্য বহু ব্যবসায়ী নিয়োজিত থাকেন। আর এ কারণে নৌকার মালিক ও মাঝিরা সহজে উপার্জনসহ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। গোলপাতা সংগ্রহের কাজে প্রায় ৩০ হাজার লোক প্রতি বছর নিয়োজিত করা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তথাপিও জীবন ও জীবিকার তাড়নায় এত অধিক সংখ্যক লোক এ পেশায় নিয়োজিত থাকে।

গোলপাতার বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন, যা বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত প্রায় ৫৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বেষ্টিত উপকূলীয় বনের প্রায় সর্বত্রই গোলপাতা জন্মে থাকে। তবে নদী ও খালের কিনারে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। আর গোলপাতা গাছও সকল স্থানের নদী-খাল ও চড়াতে বিক্ষিপ্তরূপে শোভা পাচ্ছে।

সুন্দরবন ছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে কমবেশি গোলপাতা জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া বাংলাদেশের বাহিরে আন্দামান, মায়ানমার, মালয়, পেনিনসুলা, আর্কিপেলাগো, কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, পাপুয়া নিউগিনি প্রভৃতি অঞ্চলে গোলপাতা জন্মে থাকে। গোলপাতার বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল। বিভিন্ন প্রকার ঘরের ছাউনিতে গোলপাতার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় বিধায় দিন দিন এ পাতার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গরীবের টিন হিসেবে এর কদর সর্বাধিক। ছাউনী ছাড়াও এর বহুমুখী ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রতিবছর সুন্দরবন হতে প্রায় ৭০-৮০ হাজার মেট্রিক টন গোলপাতা সংগৃহীত হয় এবং এ কাজে মৌসুমে প্রায় ৩০,০০০ লোক নিয়োজিত থাকে যা সুন্দরবনের সন্নিহিত অঞ্চলে (তিনটি জেলা) কর্মসংস্থানে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া নদীপথে গোলপাতা পরিবহনের ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার নৌকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারে কারণে বর্তমানে গোলপাতার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে এর খুচরা বাজার মূল্যও অনেকটা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকায় সাধারণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকেরা এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছে আবার টিনের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গোলপাতা পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় গোলপাতার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচের সারণীতে বিগত কয়েক বছরের গোলপাতার সংগ্রহ মাত্রা ও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

সারণী: বিগত বছরের গোলপাতার সংগ্রহ মাত্রা ও রাজস্বের পরিমাণ।

অর্থ বছর	গোলপাতা উৎপাদন (মেট্রিক টন)	রাজস্ব (টাকা)
২০১৯-২০২০	৭৯৯৩৮৫২	২১১৯৫৫১.৪০
২০১৮-২০১৯	৮৬২৪৬১০	২২৩৬৩৯১.৩৫
২০১৭-২০১৮	১০১৩৮৯.৪৬	২৮১০০১৬.০০
২০১৬-২০১৭	৯৬৪৯০.১৩৬	২৮১৭৭৩৯.৪০
২০১৫-২০১৬	৬২৭৪৮.৫২২	২৮৯৮০০২.৪৮
২০১৪-২০১৫	৩২৯৪৭৮.২১	৪৪৭২৩৮২.০১
২০১৩-২০১৪	৭৭২৩১৬৭	৪৭৮৬৬৯২.৫০
২০১২-২০১৩	১৩২৪৩০৪৪.২২	৮২৭৫০৫০.৮৫
২০১১-২০১২	১৮৮০৮৬.৪৬২	৮২৯৮৮৭১.৫০
২০১০-২০১১	৭৩২১৫৭.০০	৬৮৩০১৯৫.০০
২০০৯-২০১০	৬৮৪৪৬০.০০	৬৬৩২৩৭১.০০
২০০৮-২০০৯	৬৩০৭১৪.০০	২৭২৪৪০০.০০
২০০৭-২০০৮	৮৩.০০	৭৯৯৪৮.০০
২০০৬-২০০৭	১৯,৭৫০.০০	২৪,৬৫,৮৯৪.০০
২০০৫-২০০৬	২৯,১৯৮.০০	৩৩,৬৭,৮৬৮.০০
২০০৪-২০০৫	২৭,৮৯০.০০	৩১,২৮,২১৪.০০
২০০৩-২০০৪	১৮,৯৪১.০০	২২,২২,৫১০.০০
২০০২-২০০৩	২১,০৬০.০০	৩৬,৬৭,৪৩০.০০
২০০১-২০০২	১৮,১৭৪.০০	২৫৮৩৬১৫.০০
২০০০-২০০১	১৮,৮৯৯.০০	২৭,৯২,০৯১.০০
১৯৯৯-২০০০	৩০,৩২৪.০০	২৬,৮৭,৭২৩.০০
১৯৯৮-১৯৯৯	৩৮,৫৬২. ০০	৩৫,১০,৬০৯.৫০
১৯৯৭-১৯৯৮	৫২,২২২. ০০	৪৭,৭৭,৪০৫.০০

অর্থ বছর	গোলপাতা উৎপাদন (মেট্রিকটন)	রাজস্ব (টাকা)
১৯৯৬-১৯৯৭	৬১,৫৪৮. ০০	৫২,২৯,৬৪৭.০০
১৯৯৫-১৯৯৬	৬৪,২১৫. ০০	৫৫,৯৭,১৮১.০০
১৯৯৪-১৯৯৫	৬৪,২৮৩.০০	৫৮,৫৯,৬৯৪.০০
১৯৯৩-১৯৯৪	৬৮,০৯৪.০০	৫৯.০৬,৯০১.০০
১৯৯২-১৯৯৩	৬৬,৫১৬.০০	৫৪,৪৬,৫৯৩.০০
১৯৯১-১৯৯২	৭২,৪৩৪.০০	৫৮,২১,৫১৮.০০
১৯৯০-১৯৯১	৭২,১৪৮.০০	৫৭,৯৮,৬০৭.০০

গোলপাতার ব্যবহার

- গোলপাতার সর্বাধিক ব্যবহার হয় ঘর তৈরির ছাউনির কাজে। "গরীবের টিন" হিসাবে গোলপাতা অতি পরিচিত। এর দ্বারা নৌকার ছাউনি, কুঁড়ে ঘর, গোলাঘর, চালাঘর, গো-শালা, কাঠগোলা, দোকান প্রভৃতির ছাউনির কাজ করা হয়।
- রান্নার জ্বাল ধরাতে শুকনো পাতা ব্যবহার হয়।
- এ ছাড়া গোলপাতার সাহায্যে ছাতা, সানহ্যাট বা টোকা, রেইনকোট, ঝুড়ি, মাদুর, থলে-খেলনা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- কঁচি পাতা সিগারেটের-স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- পাতার ডাঁটা জ্বালানি হিসেবে ও বেড়া নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
- মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থল তৈরির কাজে পাতা ব্যবহৃত হয়।
- কঁচি বীজের শাঁস খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই শাঁস অত্যন্ত সুস্বাদু, অঙ্কুরিত বীজের ফোলস অত্যন্ত স্বাদযুক্ত।
- গাছের মাথি বিশেষভাবে রান্না করে সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করা যায়।
- মাথি কৃমিনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- পাতার ডাঁটা মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার জন্য জেলেরা ব্যবহার করে থাকে।
- কঁচি চারার পাতা ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে চারার মাথি কৃমিনাশক হিসেবে অত্যন্ত ফলদায়ক।
- মঞ্জুরী হতে রস সংগ্রহ করা যেতে পারে। যা গুড় ও চিনি তৈরিতে টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও রস হতে ভিনেগার তৈরি হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গোলপাতার গুরুত্ব ও উপযোগিতা

গোলপাতার ব্যবহার বহুবিধ। এর বীজ, পাতা, কান্ড, মোথা, ফুল, ফল প্রতিটি অংশ ব্যবহার উপযোগী এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। পরিপক্ক পাতাগুলোকে প্রধান শিরা থেকে আলাদা করে পাতা শুকানো হয় এবং পাতাগুলোকে ১ থেকে ২ মিটার পর্যন্ত চওড়া করে চিকন বেত দিয়ে বুনানো হয়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে এগুলো সিংগল (Shingle) নামে পরিচিত। পাতার প্রধান শিরার উপরিভাগের আবরণ দিয়ে পাল্প (মন্ড) প্রস্তুত হয় এবং এ পাল্প মাঝারী ঘনত্বের ভাল বোর্ড তৈরির উপযোগী।

চিত্রঃ উপকূলীয় অঞ্চলে নদী তীরে গোলপাতার বাগান।

গোলগাছের ফুলের নিচে লম্বা বোটাতে এক ধরনের মিষ্টি রস থাকে। এ রস পানীয় হিসাবে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। ফুল থেকে ফল হওয়ার পর এবং ফল পরিপক্ক ও শক্ত হয়ে বাদামী রং ধারণ করবার পূর্বে গনচ্যাঙ (Gonchang) পদ্ধতিতে ডালটিকে প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে এদিক সেদিক নড়াচড়া করানো হয়। এ পদ্ধতি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করে দেখা গেছে এক মাসে গড়ে দৈনিক ১৩০০ মিলি. রস পাওয়া সম্ভব। নিপা ভিনেগারে শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ এ্যাসিটিক এসিড থাকে। গোলগাছের রস থেকে চিনি প্রস্তুত করে তা থেকে এ্যালকোহল তৈরি করা হয়। অপরিপক্ক বীজের অভ্যন্তরে নরম অংশ সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে খাওয়া যায়। পরিপক্ক বীজের উপরিভাগের শক্ত অংশ দিয়ে বোতাম তৈরি হয়। চর্মরোগ, দাঁতের ব্যথা, মাথার ব্যথা ইত্যাদি রোগ উপশমে গোলপাতার ব্যবহার রয়েছে। বহুমুখী ব্যবহার ও সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গোলপাতার গুরুত্ব ও উপযোগিতা যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী।

কৃত্রিম উপায়ে গোলপাতা চাষাবাদ

চারা উত্তোলন পদ্ধতি

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে নার্সারিতে উত্তোলিত গোলপাতার চারা দ্বারা পরীক্ষামূলক বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. গোলপাতার বীজ সংগ্রহের জন্য মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন

চারা উত্তোলনের জন্য বীজ সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাল বীজ হতে ভাল চারা পাওয়া যায় এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত। সঠিক সময়ে উপযুক্ত গাছ হতে পরিপক্ক ও ভাল বীজ সংগ্রহের মাধ্যমে বীজের অধিকহারে অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করা যায়।

২. নার্সারির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

নির্বাচিত স্থান জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হতে হবে। অতিরিক্ত পলি পড়া স্থান এবং জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না এমন স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। বেড পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যা অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময়কালীন ১০/১২ দিন ব্যতীত অন্যান্য সময়ে সাধারণত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় না। নির্বাচিত স্থানটি প্রথমে ভালভাবে কোদাল বা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ পূর্বক এর মাটি নরম করে ফেলতে হবে। ডোবা পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনের জন্য সাধারণত খালের ধারে ডোবা মত স্থান যা প্রতিটি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় এরকম স্থান নির্বাচন করতে হবে।

৩. গোলপাতার বীজ সংগ্রহ

চারা উত্তোলনের জন্য বীজ সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে উপযুক্ত গাছ হতে পরিপক্ক ও ভাল বীজ সংগ্রহের মাধ্যমে বীজের অধিকহারে অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করা যায়। গোলপাতার গাছ সাধারণত ৪/৫ বৎসর বয়স হতে বীজ উৎপাদন শুরু করে। তবে চারা উত্তোলনের জন্য মাঝারী বয়সের গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করাই উত্তম। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকে এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক গাছ, পাকা ফল ধারণ করে এবং এ সময়ই চারা উত্তোলনের জন্য গোলবীজ সংগ্রহ করার উৎকৃষ্ট সময়। গোলফল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে এর রং হালকা বাদামী হতে গাঢ় বাদামী রং এ রূপান্তরিত হয়। তাই চারা উত্তোলনের জন্য শুধুমাত্র গাঢ় বাদামী ফলগুলিই সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহকালে আস্ত কাদিটাই কেটে আনতে হয়। কেটে আনার পর ফলের কাদিগুলি ৪/৫ দিন পর্যন্ত একটি ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রেখে দিতে হবে। পরবর্তিতে আঙ্গুলের হালকা চাপের দ্বারা বীজগুলি কাদি হতে আলাদা করা হয়। চারা উত্তোলনের জন্য ভাল ও পুষ্ট বীজগুলি রেখে বাকিগুলো ফেলে দিতে হবে।

চিত্রঃ গোলপাতার সংগৃহীত কাদি।

চিত্রঃ নার্সারির জন্য সংগৃহীত বীজ ।

৪. বীজ পরিশোধন ও সংরক্ষণ

সাধারণত বীজ পরিশোধনের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রয়োজন হলে বীজ পরিশোধনের জন্য মেলাথিন, ডায়াথেন এম-৪৫ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. মাটি সংগ্রহ ও বীজতলা প্রস্তুতকরণ

বীজতলা গৃহপালিত বা বন্য জন্তু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বীজতলার স্থানটি বেড়া দিয়ে ঘেরা দিতে হবে। বীজ লাগানোর পূর্বে বীজতলায় পানি দিয়ে বেডের মাটি কর্দমাক্ত করে ফেলতে হবে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বীজতলার মাটি ভেজা থাকা প্রয়োজন। বীজ বপনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে গোল বীজ খুব বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না বিধায় কাদি হতে ছাড়ানো বীজগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চারা উত্তোলনের জন্য বপন করা প্রয়োজন।

৬. চারা উত্তোলন

সাধারণত ২ ধরনের পদ্ধতিতে, গোলপাতার চারা উত্তোলন করা হয়। যেমন- বেড পদ্ধতি এবং ডোবা পদ্ধতি, নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

ক) বেড পদ্ধতি

১২মি. x ১২মি. আকারের বেড তৈরি করে বেডের উপরিভাগে মাটি সমতল করে দিতে হবে। পানি নিষ্কাশন, পরিচর্যা প্রভৃতি কাজের সুবিধার্থে দুই বেডের মাঝামাঝি এবং চারিপার্শ্বে ৩০সে.মি. প্রস্থ এবং ২০সে.মি.গভীর নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৫সে.মি. x ৫সে.মি. দুরত্বে ড্রিবলিং পদ্ধতিতে বীজের বোঁটা উপরের দিকে রেখে ২/৩ অংশ মাটিতে পুঁতে একটু কাত করে বীজ বপন করতে হবে। এ ধরনের একটি বেডে ২৮০০-৩৫০০টি বীজ বপন করা যায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম শেষ না হওয়া পর্যন্ত বীজতলার মাটি ভেজা থাকা প্রয়োজন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বেডের কোথাও পানি জমে না থাকে। বেডে বপনকৃত বীজে অঙ্কুরোদগমের হার ৯০-৯৫% এবং একটি ১২মি. x ১২মি. বেড হতে ১৮০০-২০০০টি রোপণযোগ্য চারা পাওয়া যায়।

চিত্র : ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে নার্সারিতে উত্তোলিত গোলপাতার চারা।

খ) ডোবা পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে বীজগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়ার পরিবর্তে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে একটা বীজের উপর আর একটা বীজ পড়ে না থাকে। শিকড় না গজানো পর্যন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জোয়ারের পানিতে ভাসমান বীজগুলি পরবর্তীতে একটার উপর আর একটা উঠে না থাকে। বাগান সৃজনের আগ পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে বীজতলায় আগাছা পরিষ্কার, কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতি পরিচর্যা করতে হবে। ডোবা পদ্ধতিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বেড়ে বপনকৃত বীজের অঙ্কুরোদগমের হারের চেয়ে কিছুটা কম হতে দেখা যায়।

৭. রোগ-জীবাণু নিয়ন্ত্রণ

গোলপাতার চারার বীজতলায় রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব সাধারণত দেখা যায় না। বাগান সৃজনের আগ পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে আগাছা পরিষ্কার, কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে বীজতলার পরিচর্যা করতে হবে। কোন কারণে অনেকদিন জোয়ারের পানি না উঠার ফলে বেডের মাটি শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা

বীজতলা গৃহপালিত বা বন্য জন্তু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বীজতলার স্থানটি বেড়া দিয়ে ঘেরা দিতে হবে। যাতে জোয়ারের পানিতে ভাসমান বীজগুলি স্রোতের টানে ভেসে না যায়। গোলপাতার নার্সারিতে পলিযুক্ত মাটিতে ঘাস জাতীয় আগাছার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় তা দমনে যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গোলপাতার বাগান সৃজন

গোলপাতা সুন্দরবনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে। সুন্দরবন, সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী ও উপকূলীয় এলাকায় মোটামুটি লবণাক্ত অঞ্চল যেখানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় সেখানেই গোলাপাতা ভাল জন্মে। বর্তমানে এসকল অঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণ নিজস্ব জমিতে যেখানে জোয়ার-ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় এরূপ স্থানে ব্যক্তি উদ্যোগে গোলপাতার চাষ করা হচ্ছে । উপকূলীয় বনায়ন এলাকায় ইতোমধ্যেই গোলপাতার চাষ শুরু হয়েছে এবং উহা খুবই আশাব্যঞ্জক।

কৃত্রিমভাবে গোলপাতার বাগান সৃজনে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১) স্থান নির্বাচন

স্থান নির্বাচনকালে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে;

- খাল বা নদীর মোহনা ও কিনারায় জেগে ওঠা নতুন চর বা খালি জায়গা নির্বাচন করতে হবে।
- জমি মোটামুটিভাবে সমতল ও উঁচু হতে হবে। নিচু, গর্ত বা বেশি ঢালু জমি পরিত্যাগ করা উচিত।
- নির্বাচিত জমির মাটি মোটামুটিভাবে শক্ত প্রকৃতির, কর্দমাক্ত এবং ঘাস প্রজাতি (যেমন- উরি ঘাস, ধানশী, নল খাগড়া, মালিয়া ঘাস, হোগলা পাতা প্রভৃতি) দ্বারা আচ্ছাদিত হতে হবে। বেশি নরম মাটির জায়গা এবং ঘাস জন্মায় নি এমন জায়গা পরিহার করা উচিত।
- নির্বাচিত স্থানে জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হতে হবে। অতিরিক্ত পলি পড়া স্থান এবং জোয়ার ভাটার পানি দ্বারা প্লাবিত হয় না এমন স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

২) প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় প্রস্তুতকরণ

প্রস্তাবিত এলাকায় অবস্থিত জঙ্গল বিশেষ করে উড়ি ঘাস, ধানশী, নল খাগড়া, মালিয়া ঘাস, হোগলা পাতাসহ লতাপাতা ও অপ্রয়োজনীয় গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে। কর্তিত জঙ্গল এলাকা নদী বা খালের তীরবর্তী নিচু হওয়ায় প্রতিনিয়ত জোয়ার ভাটার দ্বারা প্লাবিত হওয়ার কারণে কর্তিত জঙ্গলসমূহ জোয়ারের পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে। নতুবা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তুপাকারে জমা করে রেখে দিলে পরবর্তীতে উহা পঁচে গিয়ে জমিতে জৈব বা সবুজ সারে পরিণত হবে। এতে করে প্রস্তাবিত বাগান এলাকা সম্পূর্ণভাবে আগাছামুক্ত হবে। ফলে গোলপাতার চারা লাগানোর জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো এবং পরীক্ষামূলকভাবে সৃজিত বাগানে লাগানো গোলপাতার গাছে বৃদ্ধির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চারার মধ্যবর্তী সারির দুরত্ব ২মি.x ২মি. উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। গোলপাতার মাতৃগাছে সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক বীজ পাওয়া যায় তখন তা সংগ্রহ পূর্বক প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে বপন দ্বারা চারা উত্তোলন করা হয়। বাগান এলাকা প্রস্তুতের পরই মডেল ও দুরত্ব অনুসারে (২মি. x ২মি.) রশি দ্বারা মেপে নির্দিষ্ট স্থানে জঙ্গল থেকে সংগৃহীত গরানের খুঁটি বসাতে হবে (স্ট্যাকিং)। এক হেক্টর বাগানের জন্য উপর্যুক্ত দুরত্ব অনুসারে প্রায় ২৫০০ টি খুঁটি প্রয়োজন হবে।

৩) চারা সংগ্রহ

ইতঃপূর্বে নার্সারিতে উত্তোলিত ৩/4 মাস বয়সের গোলপাতার চারাগুলো খুব সতর্কতার সাথে কাদামাটি থেকে তুলতে হবে যাতে চারাতে সংযুক্ত বীজটি ঝরে পড়ে না যায়। চারাগুলো তোলার পর তার নগ্ন শিকড়ের কাদামাটি গুলো পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর যথা সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বাগান এলাকায় লাগানোর জন্য দেশীয় খোলা নৌকাযোগে পরিবহন করতে হবে। চারা এলাকায় পৌছানোর পর লাগানোর নিমিত্তে ঝুড়িতে করে সতর্কতার সাথে প্রতিটি গর্তে সরবরাহ করতে হবে। প্রস্তাবিত বাগান এলাকার নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে নার্সারি সৃজন করা উচিত যাতে কম সময়ে চারাগুলো এলাকায় পৌছানো সম্ভব হয়।

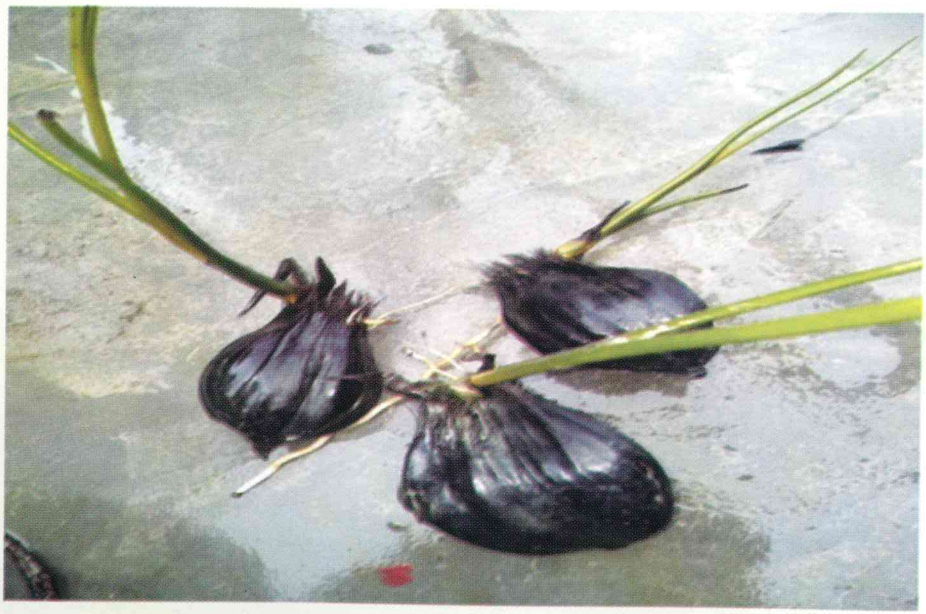

চিত্রঃ রোপণের জন্য উত্তোলিত চারা।

৪) চারা রোপণ

উপকূলীয় এলাকায় বর্ষাকালের পর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস গোলপাতার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। গোলপাতার চারাগুলো সাবধানে গর্তে বসিয়ে চার পার্শ্বের মাটি দ্বারা চারার গোড়াতে কচ্ছপের পিঠের মত সামান্য উঁচু (২″- ৩″) করে ঢেকে দিতে হবে যাতে চারার উপযুক্ত বীজটি ও নগ্ন শিকড়গুলো মাটির অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট থাকে। চারাগুলো রোপণের পর চারাকে স্ট্যাকিং খুঁটির সাথে রশি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যাতে চারাটি বা তার পাতাগুলো বাতাসে হেলে না পড়ে।

চিত্রঃ ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবনের চরাঞ্চলে রোপিত গোলপাতার চারা।

৫) সৃজিত বাগান ও চারার যত্ন

গোলগাছের চারা রোপণের পর চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। একটি সফল বাগান প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৪ বছর যাবত কঠোর সতর্কতার সাথে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। সৃজিত বাগান সমূহে আগাছা নিয়ন্ত্রণে দিনমজুর নিয়োগ করে ১ম বছরে ৪ বার (৩ মাস অন্তর), ২য় বছরে ৩ বার (৪ মাস অন্তর), ৩য় ও ৪র্থ বছরে ২ বার (৬ মাস অন্তর), আগাছা বাছাই করলে ভাল হয়। সৃজিত বাগান ঘেরা-বেড়ার পরিবর্তে লোকবলের দ্বারা পাহারার ব্যবস্থা করা গেলে বন্য শুকরের উপদ্রব বহুলাংশে কমে যাবে। এছাড়া সৃজিত বাগানে গরু ছাগলের উপদ্রব হলে প্রয়োজনে ঘেরা-বেড়া প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন কারণে কিছু চারা মারা যায়, তাই যেখানে চারা মারা যাবে সেখানে ১ম/২য় বছরের মধ্যে চারা রোপণের মাধ্যমে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। পর্যাপ্ত শেওলা চারাগুলোকে আঁকড়িয়ে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলে। এদের উপদ্রব থেকে চারাগুলোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ঘেরা-বেড়া ও লোকবল দ্বারা প্রতিনিয়ত কচুরীপানা, আবর্জনা ও শেওলামুক্ত রাখা। বাগান উত্তোলনের ২য় বা ৩য় বছরে গাছের গোড়ার শুকনো পাতাগুলো ধারাল কাঁচি বা ছুরি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে।

গোলপাতা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সম্প্রতি অনুসৃত গোলপাতা কাটিং রুলস নিম্নরূপ অনুসরণ করার জন্য পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে ঃ-

- গোলপাতা সংগ্রহ প্রতি বছর নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত নির্ধারিত।
- গোলপাতার মাঝ পাতা ও একটি ঠেক পাতা রেখে কর্তন।

- পাতা সংগ্রহকালে মরা-পঁচা ও শুষ্ক পাতা কেটে ফেলা।
- পাতা সংগ্রহের সময় ফুল ও ফলের কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা।
- স্যাম্পল প্লট ও গবেষণা ফিল্ডের ক্ষতি না করা।
- মাটির নিচ হতে পাতা না কাটা।
- নির্ধারিত অঞ্চলে পাতা কাটা শেষ করে অন্যত্র সংগ্রহ ও অনুপ্রবেশ করা।
- গোলপাতা সংগ্রহের নিমিত্তে নির্ধারিত মানচিত্র অনুযায়ী গোলপাতা গাছ হতে পাতা সংগ্রহ বাঞ্চনীয়।

এছাড়া সঠিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নিম্নরূপ "কুপ রূলস" অনুসরণের ব্যবস্থা করা হয়।

- সমগ্র সুন্দরবন ব্যাপী বার্ষিক মৌসুম ভিত্তিতে গোলপাতা সংগ্রহ করা হয়। ব্যবস্থাপনার জন্য সুন্দরবনকে ৭টি অস্থায়ী কুপে ভাগ করা হয়েছে যথা- সুপতি-ভোলা, চাঁদপাই, সেলা, ভদ্রা, শিবসা, আড়ুয়া শিবসা ও সাতক্ষীরা। অধিকাংশ কুপই স্থানীয় নদীর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। প্রতি কুপে কুপ অফিসার ও স্টাফবৃন্দ নির্ধারিত এরিয়াতে "ফেলিং রুলস" ঠিকমত অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং নির্ধারিত খাল বা খালের অংশে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।
- তুফান মুক্ত শান্ত মৌসুমে সমুদ্রের সন্নিকটে কাজ করা।
- যথাযথভাবে কাজ তদারকির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রতি কম্পার্টমেন্টের ১ ঃ ৫০,০০০ স্কেলে মানচিত্র তৈরি ও সরবরাহ করা।
- গোলপাতা ও নৌকায় ব্যবহার্য সকল ঝুলি, থারিস, মলম, মাস্টস প্রভৃতির গোলপাতা সংগ্রহের পূর্বেই কুপ অফিসার কর্তৃক হ্যামার মার্ক করা, নির্ধারিত কম্পার্টমেন্ট, ফেলিং সিরিজ ও ওয়ার্কিং সার্কেল নির্ধারণ করা এবং ঝুল, থারিস, মলম, প্রভৃতির জন্য সঠিক পদ্ধতিতে "সুপারভিশন" নিশ্চিত করা।

উপসংহার

গোলপাতা ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষের মধ্যে অন্যতম বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী একটি প্রজাতি যার অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক, পরিবেশগত গুরুত্ব বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়নের জন্য অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গবেষণা স্টেশনে গোলপাতার বীজ সংগ্রহ ও চারা উত্তোলন এবং নার্সারিতে উত্তোলিত গোলপাতার চারার মাধ্যমে পরীক্ষামূলক বনায়নের ফলে দেখা গেছে যে, গোলপাতা একটি ব্যবহার উপযোগী, দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক টিকে থাকার হার সম্পন্ন ম্যানগ্রোভ প্রজাতি। "গরীবের টিন" গোলপাতা জ্বালানী হিসেবে, হস্তশিল্পে, মাছ ধরার কাজে, সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে, কৃমিনাশক হিসেবে, ভেষজ ওষুধ হিসেবে এর বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলের চরে, সুন্দরবন সংলগ্ন ফাঁকা অঞ্চলে নার্সারিতে উত্তোলিত গোলপাতার চারার মাধ্যমে গোলপাতার পরীক্ষামূলক বনায়নের মাধ্যমে চর উন্নয়ন ও ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য সম্প্রসারিত করার কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব যার ফলে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী এই ম্যানগ্রোভ প্রজাতি সংরক্ষিত হবে এবং ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম প্রসারিত হবে এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, বহুমুখী ব্যবহার ও গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বলা যায়, গোলপাতার নার্সারি উত্তোলন, বনায়ন ও সংরক্ষণ আবশ্যক যার ফলে বাংলাদেশের বৃক্ষ সম্পদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তালের নার্সারি উত্তোলন ও বনায়ন কৌশল

ভূমিকা

তালগাছ একক কান্ড বিশিষ্ট Arecaceae পরিবারের একটি বৃহৎ বৃক্ষ যার বৈজ্ঞানিক নাম *Borassus flabellifer* । তালের ব্যাপক বনায়নের জন্য চারার সংকট সব সময়ই প্রকট। আবার সরাসরি তালের বীজ বপন করে আশানুরূপ চারা জন্মানো সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ তালগাছের চারা উত্তোলন ও রোপণ পদ্ধতির একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এ পদ্ধতিতে সমগ্র উপকূলীয় এলাকাসহ সারাদেশে তালের চারা উত্তোলন ও বনায়ন করা সম্ভব। এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে উপকূলে বসবাসকারী জনসাধারণসহ সারাদেশের কৃষক, বন বিভাগ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বৃক্ষ সংশ্লিষ্ট মানুষেরা সহজ পদ্ধতিতে তালের চারা উত্তোলন করে তালের বনায়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে। তাছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের বন নির্ভরশীল জনগণ ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে একদিকে যেমন তালের বনায়নের মাধ্যমে নিজেরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বজ্রপাতে জীবন হানি হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারবে।

তাল গাছের পরিচিতি

তালগাছ বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি বৃহৎ বৃক্ষ যা লম্বায় প্রায় ৩০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তালগাছের মাথার শেষভাগে ছাতা আকৃতির পাতা শোভা পায়। একটি তালগাছে ডগাযুক্ত পাখা সদৃশ ২৫-৪০টি পাতা থাকে। পাতার ডগা লম্বা এবং উভয় পার্শ্বে করাতের মতো কালো দাঁত থাকে। তালগাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট বৃক্ষ। পুরুষ ও স্ত্রী তালগাছ আলাদাভাবে জন্মায়। পুরুষ গাছে শাখাযুক্ত ৫০-১০০ সে.মি. লম্বা মঞ্জুরী হয়, যাকে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন এলাকায় জট বলে থাকে। স্ত্রী গাছে ১-১.৫ মিটার লম্বা মঞ্জুরীদন্ডে গোটা গোটা ফুল ধরে। প্রতিটি মঞ্জুরীদন্ডে ১৫-২০টি ফল ধরে। কাঁচা ফল হালকা বাদামী বা সবুজ রঙের হয়। একটি স্ত্রী তালগাছে ২৫০-৩৫০টি ফল ধরে। ফল বড় আকারের, গোলাকার, ১৫-২০ সে.মি. ব্যাসার্ধের হয়ে থাকে। প্রতিটি ফলে সাধারণত ২-৩টি বীজ থাকে। পরিপক্ক ফলের রং কালো বা গাঢ় বাদামী হয়ে থাকে। তালগাছ বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার অন্যতম ঐতিহ্য।

তালগাছকে ইংরেজিতে Palmyra palm বলা হয়। Arecaceae পরিবারের এ গাছটির আদিবাস ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এটি প্রধানত বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে জন্মায়। এটি বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অযত্নে, অবহেলায় জন্মাতে দেখা যায়। তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা গুলোতে এর আধিক্য বেশি।

তালগাছের গুরুত্ব

তালগাছের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত গুরুত্ব অপরিসীম। একটি তালগাছ প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, তালগাছে ১২-১৫ বছর বয়সের মধ্যেই ফুল ও ফল ধরা শুরু করে। তাছাড়া এক কান্ড বিশিষ্ট হওয়ায় কম স্থান দখল করে। তালগাছ একটি বহুব্যবহার উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি। একটি পুরুষ অথবা স্ত্রী তালগাছের মঞ্জুরীদন্ড থেকে প্রতি বছর প্রায় তিন মাসব্যাপী (মার্চ-মে পর্যন্ত) রস সংগ্রহ করা যায়। মৌসুমে একটি গাছ থেকে ২৫০-৪০০ লিটার পর্যন্ত রস সংগ্রহ করা যায়। সদ্য আহরিত রস খুবই সুস্বাদু।

চিত্রঃ তালসহ স্ত্রী তালগাছ।

চিত্রঃ পুরুষ তালগাছ মঞ্জুরীসহ (জট)।

এ পানীয় বিক্রি করে সরাসরি লাভবান হওয়া যায়। রস থেকে সুঘ্রাণ গুড়/পাটালি তৈরি করা হয়। প্রতি লিটার রস থেকে ২০০-২৫০ গ্রাম গুড় পাওয়া যায়। একটি তালগাছ থেকে মৌসুমে ৩০-৩৫ কেজি তাল গুড় তৈরি করা যায়। গুড় থেকে মিছরি/তাল মিছরি তৈরি করা হয় যা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তালের রস ভিনেগার ও তাড়ি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী তালগাছের কাঁচা ফলের শ্বাস সব শ্রেণির মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় ও মুখরোচক। পাকা ফল পানিতে কচলিয়ে রস বের করে রান্না করে সুস্বাদু খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা তালের রস দিয়ে নানা রকম মজাদার পিঠা, বড়া ও পায়েস তৈরি করা হয়। তালের পিঠা আমাদের গ্রাম এবং শহরে বেশ জনপ্রিয়। পাকা ফল বিক্রি করেও একটি গাছ থেকে ২-৩ হাজার টাকা উপার্জন করা যায়। তালগাছের পাতা পাখা তৈরির কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ মহিলারা তালগাছের পাতা ও আঁশ দিয়ে টুপিসহ বিভিন্ন সৌখিন কুটির শিল্প দ্রব্যও তৈরী করেন। বয়স্ক তালগাছের কাঠ বেশ শক্ত ও টেকসই। গ্রামীণ ঘরবাড়ীর খুঁটি, আড়া, রুয়া, বাতা, বর্গা ইত্যাদি তৈরিতে তাল কাঠ ব্যবহৃত হয়। ফলে এর চাহিদা এবং দাম অনেক বেশি। ঘরের ছাউনি, মাদুর, চাটাই, ব্যাগ, ঝুড়ি তৈরির কাজে শুকনা তালপাতা ব্যবহৃত হয়। গ্রামে-গঞ্জে তালগাছ থেকে ডিঙ্গি নৌকা (ডোঙ্গা) তৈরি করা হয়। শুকনা ডগা ও পাতা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তালগাছের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেশবান্ধব ও শিল্পময়। বাবুই পাখিসহ বিভিন্ন ধরণের পাখি তালগাছকে নিরাপদ আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহার করে। তাছাড়া বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় তালগাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, তালগাছ প্রায় ৩০০ মাইল/ঘন্টা পর্যন্ত বাতাসের বেগে সুন্দরভাবেই টিকে থাকতে পারে। উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জ্বলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষা পেতে তালগাছের ভূমিকা অপরিসীম। শুকনো অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম হয়ে থাকে সে সমস্ত এলাকায় তাল গাছ রোপণে ভূমির পানির স্বল্পতা দূর করা যায়। কেননা তালগাছের স্পঞ্জি শেকড় পানি ধরে রাখতে সক্ষম যা মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখে। কৃষি জমির আইলে তালগাছ রোপণ করলে ভূমিতে পানি সরবরাহ সঠিক থাকে। তাছাড়া তালগাছ ভূমি ক্ষয়রোধে ভূমিকা রাখে। তালগাছ পাখিদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার হয় ফলে প্রাকৃতিকভাবে কৃষি জমির ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে বজ্রপাতের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সৃষ্ট বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য এবং বজ্রপাতের হাত থেকে মানুষের জীবন রক্ষার্থে কৃষি জমির আইলে, রাস্তার ধারে তালগাছ লাগানো একান্তভাবে প্রয়োজন।

তালগাছ কমে যাওয়ার কারণ

এক সময়ের আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্য তালগাছ হারিয়ে যেতে বসেছে। আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগেও দেশের গ্রামীণ মাঠে-ঘাটে এবং রাস্তার পাশে সারি সারি তালগাছ আকাশে উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। কালের আবর্তে তালগাছ বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। তালগাছে বাবুই পাখির বাসা বাঁধার মনকাড়া দৃশ্য আজ আর খুব একটা চোখে পড়ে না। বিগত বছরগুলোতে দেশের গ্রামে-গঞ্জে নির্বিচারে তালগাছ কর্তন করা হয়েছে। গ্রামীণ বাড়ীঘর নির্মাণে এবং ইট-ভাটায় এসব গাছ ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে নতুন করে তালগাছ রোপণ করা হয় নি বললেই চলে। কৃষকেরা তালের চারা রোপণে খুব একটা আগ্রহী হন না। কারণ এটি খুবই ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং গাছ বড় হতে অনেক সময় লাগে। বরং কৃষকেরা কম সময়ে লাভবান হওয়া যায় এমন দ্রুত বর্ধনশীল কাঠ জাতীয় গাছ লাগাতে বেশি আগ্রহী। আবার তালের চারার চাহিদা তুলনামূলক কম থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় না। আমাদের দেশে সরকারিভাবে তালগাছের ব্যাপক বনায়ন করা হয় নি। দেশে বাণিজ্যিকভাবে তালের চারা উৎপাদন হয় না। ফলে চারা সংকটের কারণেও কৃষকেরা তালের চারা রোপণে উৎসাহী নন। তাছাড়া ক্ষেত-খামারে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছগুলো যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে ঠিকমত বাড়তে ও টিকে থাকতে পারে না। এভাবে অযত্ন, অবহেলায় ধীরে ধীরে তালগাছ কমে যাচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকায় তালগাছ বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতের আশঙ্কা উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় এবং সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের আঘাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এসব ঘূর্ণিঝড়ে গাছপালা ভেঙ্গে এবং উপড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। তবে পাম প্রজাতির গাছ বিশেষ করে তালগাছকে এ বিপর্যয়ের মধ্যেও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কাজেই ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় বর্তমানে যে সকল বৃক্ষ প্রজাতিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে তালগাছ অন্যতম। তালের ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা সম্ভব। তালগাছের শিকড় গুচ্ছাকারে বিস্তৃত হয়ে মাটিকে শক্ত করে ধারণ করে। উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ খাল ও নদ-নদীর পাড়ে বনায়নের মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় রোধ করা যায় এবং চর ভূমি স্থায়ী করা যায়। এ বৃক্ষ রোপণ করে সড়ক ও সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করা যায়।

তালগাছ রোপণ ও পরিচর্যায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তালগাছ রোপণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তালগাছের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। তালগাছ রোপণ ও পরিচর্যা এককালীন ঘটনা নয় বরং এটি প্রকৃতি নির্ভর এবং একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট গতিতে চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি সচল রাখতে আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে তালগাছের গুরুত্ব এবং এর অর্থনৈতিক দিকটা ভালভাবে তুলে ধরতে হবে। তালগাছ জমির আইলে বা অন্য যে কোনো জমিতে লাগালে যে জমির ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না বরং শুষ্ক মৌসুমে পানির ভারসাম্যতা বজায় থাকে তা ভালভাবে বুঝাতে হবে। এছাড়া একটা নির্দিষ্ট সময় পর হতে দীর্ঘদিন যাবত তালগাছ হতে প্রতিবছরই কিছু অর্থের প্রাপ্তি ঘটবে তা ভালভাবে বুঝাতে হবে। অধিকন্তু, আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানার পতিত জায়গায় তালগাছ লাগানো ও পরিচর্যা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের

সঙ্গে মত বিনিময় করেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাছাড়া রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, খালের পাড়ে এবং পতিত সরকারি ও বেসরকারি মালিকাধীন জমিতে তালের চারা রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সারাদেশে ১০ লক্ষ তালের চারা রোপণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা বজ্রপাত হতে মানুষের জীবনহানি হ্রাস করবে।

নার্সারিতে তালের চারা উত্তোলন পদ্ধতি

তালের ব্যাপক বনায়নের জন্য চারার সংকট সব সময়ই প্রকট। বাংলাদেশে সাধারণত তালের বীজ সরাসরি মাটিতে বপন করে তালের গাছ লাগানো বা চাষ করা হয়। সরাসরি মাটিতে তালের বীজ বপন করে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীন প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ নার্সারিতে তালের বীজ হতে অঙ্কুর নল (জার্ম টিউব) বিচ্ছিন্ন করে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

১। মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন ও বীজ সংগ্রহ

আগষ্ট থেকে অক্টোবর (ভাদ্র-কার্তিক) মাস পর্যন্ত গাছে পাকা তাল পাওয়া যায়। অনেক তাল গাছ রয়েছে এমন এলাকা থেকে মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন করে পাকা তাল সংগ্রহ করতে হবে। মাতৃবৃক্ষ নির্বাচনের সময় তালগাছের কান্ডের আকৃতি, সুস্থ, সবল, ফলের আকৃতি যেন বড় হয়, গাছে ফল ধরার সংখ্যা যেন বেশি হয়, তালের স্বাদ যেন মিষ্টি হয় এমন তালগাছ মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন করার সময় বিবেচনায় আনতে হবে। সংগ্রহ করা তাল পানিতে ভিজিয়ে হাত দ্বারা কচলিয়ে আঁশ থেকে রস বের করে বীজ আলাদা করতে হবে। তালের একটি বীজের ওজন ১০০-৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। সংগৃহীত বীজ সতেজ অবস্থায় রাখতে হবে।

২। নার্সারি বেড তৈরি

তালের চারা উত্তোলনের জন্য সমতল ভূমিতে অস্থায়ী নার্সারি বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সিড বেড ১২মি.×১.২মি. আকারের অথবা সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যে তৈরি করা যেতে পারে। পাকা অথবা ইট বিছানো মেঝেতে নার্সারি বেড তৈরি করা যেতে পারে।

চিত্রঃ কম্পোস্ট দিয়ে তৈরীকৃত তালের নার্সারি বেড।

আবার মাটিতে নার্সারি বেড তৈরি করা যায়। তবে এক্ষেত্রে চারার শিকড় যাতে মাটিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রথমেই পলিথিন শিট বিছিয়ে দিতে হবে। ইট, কাঠের তক্তা বা সুপারি গাছের ফালি দিয়ে বেডের চারিদিকে ৪০সে.মি. উঁচু করে এজিং (কিনারা) তৈরি করতে হবে। এরপর ৫০% মাটি, ২৫% কাঠের গুড়া, ২০% গোবর এবং ৫% ছাইয়ের মিশ্রণ দ্বারা ৩৮ সে. মি. পুরু করে নার্সারি বেড ভরাট করতে হবে। সংগৃহীত মাটি, গোবর সার এবং কাঠের ঘুণ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে অন্য কোনো আবর্জনা না থাকে। বেলে মাটি অথবা কম্পোস্ট দিয়েও বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

৩। বেডে বীজ বপন

সংগ্রহের পরপরই বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। বেডে পরিপক্ক সতেজ তালের বীজ বপন করতে হবে। বীজগুলি পাশাপাশি রেখে বীজতলার উপর সাজাতে হবে এবং বীজের উপর ২-৩সে.মি. পুরু করে আবার মিশ্রণ দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। রৌদ্রের আধিক্য থাকলে বীজতলার উপর কচুরিপানার স্তর দেয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ তালের বীজ।

চিত্রঃ বেডে বীজ বপন।

৪। নার্সারি বেড পরিচর্যা

বীজতলায় নিয়মিত পানি দিয়ে সব সময় ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৩-৪সপ্তাহের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করবে। বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্রের যে আবরণী বের হয়ে আসে তা দেখতে শিকড়ের মত কিন্তু আসলে তা শিকড় নয়। এই বীজপত্রের আবরণীর মাঝে ফাঁপা থাকে, অগ্রভাগে ভ্রূণ অবস্থান করে এবং টিউবের আকৃতিতে বৃদ্ধি পায়। একে অঙ্কুর নল বা জার্ম টিউব বলা হয়। হলদে রং এর অঙ্কুর নলের অগ্রভাগে ভ্রূণ আবৃত থাকে। এটি বৃদ্ধি পেয়ে মাটির গভীরে প্রবেশ করে। অঙ্কুর নলের বৃদ্ধি ৭ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে ১৫-৪০সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। অঙ্কুর নল লম্বা হবার পর ভ্রূণ কান্ড **(Coleoptile)** এবং ভ্রূণ মূল **(Coleorhiza)** এর বৃদ্ধি শুরু হয়। ভ্রূণ মূল হতে শিকড় ও অনুশিকড় গজাতে থাকে এবং বীজতলার নিচের মেঝেতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। ভ্রূণ কান্ডের মাথা বৃদ্ধি পেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং এটি যখন মিশ্রণের উপর দৃশ্যমান হবে তখন বীজের সাথে অঙ্কুর নলের সংযোগ কেটে বিচ্ছিন্ন করে টিউব আকৃতির চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে।

৫। পলিব্যাগে চারা স্থানান্তর ও পরিচর্যা

বীজতলায় উত্তোলিত চারা সাধারণত ৭ সপ্তাহ পর পলিব্যাগে স্থানান্তরের উপযুক্ত হয়। পলিব্যাগ ভরাটের জন্য ৫ ভাগ মাটির সাথে ১ ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। তালের অঙ্কুরিত চারা বা জার্মটিউব রোপণের জন্য ২৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি.বা ২২সে.মি × ৩০ সে.মি. আকারের ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

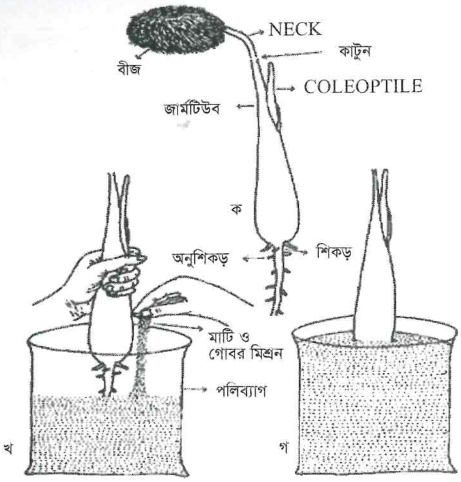

চিত্রঃ অঙ্কুরিত চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর।

চিত্রঃ পলিব্যাগে স্থানান্তরিত তালের চারা।

তবে চারা উত্তোলনের সময় অবশ্যই খরচের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রথমে বীজতলার একপাশের নিচ থেকে মিশ্রণ খনন করে বা মিশ্রণ সরিয়ে চারা উন্মুক্ত করতে হবে। অঙ্কুর নলের উপরে অর্থাৎ বীজ সংলগ্ন চিকন স্থান কেটে বীজ থেকে চারা আলাদা করতে হবে। প্রথমত পলিব্যাগের ১/৩ অংশ (তিনভাগের একভাগ) গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরতে হবে। এরপর চারাটি পলিব্যাগের মাঝামাঝি এমনভাবে রাখতে হবে যেন চারার গোড়া প্রায় ৫সে.মি. ব্যাগের মধ্যে থাকে। অতঃপর গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে পলিব্যাগের বাকি অংশ ভরাট করে দিতে হবে। পলিব্যাগে চারা স্থানান্তরের পরে অন্তত ২-৩ সপ্তাহ আংশিক ছায়ায় রাখতে হবে। তারপর চারাগুলি বেড়ে সাজিয়ে রেখে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। পলিব্যাগের চারা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে এবং পোকামাকড় ও রোগ-বালাই দমন করতে হবে। পরিশেষে, নার্সারিতে চারা ৭-৮ মাস রক্ষণাবেক্ষণ করার পর মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়।

চিত্রঃ নার্সারিতে উত্তোলিত তালের চারা।

তালগাছ বনায়ন পদ্ধতি

তালের বংশবৃদ্ধির জন্য দেশের সর্বত্রই তালের বনায়ন করা খুবই প্রয়োজন। সাধারনত ২ ধরণের পদ্ধতিতে তালের বনায়ন করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো-

ক) সরাসরি বীজ বপন

তালের বংশ বিস্তারের জন্য সাধারণত তালের বীজ সরাসরি মাটিতে বপন করা হয়। এ পদ্ধতিতে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-কার্তিক) মাসে পাকা তাল সংগ্রহ করে পরিপক্ক বীজ আলাদা করতে হবে। নির্বাচিত জমিতে ৩০সে.মি. × ৩০সে.মি. × ৩০সে.মি. আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ২টি করে বীজ ৫-৬সে.মি. গভীরে বপন করে ছাই মেশানো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বপনের ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুর নল বের হয়ে মাটির ৩০-৪০ সে.মি. গভীরে প্রবেশ করে। বীজ বপনের ৭-৮ মাস পর মাটির উপরিভাগে চারার একটি সূঁচালো পাতা দেখা যায়। চারাটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১০-১২ সে.মি. হলে গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। এ সময় গবাদি পশুর হাত থেকে চারাকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা রোপণ

বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পরপরই পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা মাঠে রোপণ করা উচিত। তবে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে অথবা পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা এপ্রিল-মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাস পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। তালের চারা বর্ষাকালে পানি জমে না এমন স্থানে লাগানো যায় আবার যে সকল জমি বর্ষার সময় ১০-১৫ দিন সাময়িকভাবে প্লাবিত হয় সেখানে বর্ষার পরপরই পলিব্যাগের চারা লাগানো যেতে পারে। রাস্তার ধারে, বেড়ি বাঁধের ঢালে, বসতবাড়ির আশপাশে, পতিত জমিতে, কৃষি জমির আইলে, নদ-নদীর পাড়ে ব্যাপক হারে তালের চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য এপ্রিল-মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে নির্দিষ্ট স্থানে কোদাল বা অগার দিয়ে ৬১সে.মি. × ৬১সে.মি. × ৬১সে.মি. (২ফুট × ২ফুট × ২ফুট) গর্ত করতে হবে। গর্ত প্রতি ১০ কেজি গোবর সার দিতে হবে। গর্ত করার সময় উপরের অংশের মাটি আলাদা রাখতে হবে এবং নিচের অংশের মাটি আলাদা রেখে ১০ কেজি গোবর সার সমানভাবে দুই অংশের মাটির সঙ্গে মিশাতে হবে। উপরের অংশের মাটি গর্তের নিচে এবং নিচের অংশের মাটি গর্তের উপরের দিকে দিয়ে ভরাট করে একটি স্টেকিং বা কাঠি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। বর্ষা শুরু হলে চিহ্নিত স্থানে পলিব্যাগের আকৃতির সমান গর্ত করতে হবে। পলিব্যাগটি ছিঁড়ে পলিব্যাগের মাটিসহ চারা গর্তে বসিয়ে গুঁড়ো মাটি দিয়ে গর্তের ফাঁক ভরাট করে ভালভাবে চারার গোড়ার মাটি চেপে দিতে হবে। চারা থেকে চারা ৪ থেকে ৫ মিটার দূরত্বে লাগানো ভাল। পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা মাঠে টিকে থাকার হার শতকরা ৯৪ ভাগ। আবার বাংলাদেশের উপকূলীয় অগ্রতট এলাকায় এমন অনেক পতিত ভূমি আছে, যেখানে বছরে অন্তত ৩ মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। উক্ত ভূমি অনুৎপাদনশীল ও ম্যানগ্রোভ বনায়নের জন্য অনুপযুক্ত। উক্ত ভূমিতে জুন-জুলাই মাসে ৭মি. × ১.৫মি. × ০.৫মি. আকারের ডাইক (ঢিবি) তৈরি করে ৪ মিটার দুরত্বে তালের চারা রোপণ করে সফলভাবে বাগান সৃজন করা যায়। উচ্চতা ও চওড়া ঠিক রেখে লম্বায় কম-বেশি করেও ডাইক তৈরি করা যায়। রোপিত চারাগুলো নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। গবাদি পশুর উপদ্রব এবং রোগ বালাই থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। শুকনা মৌসুমে প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপকূলীয় এলাকায় তালগাছ বনায়নের খন্ড চিত্র

চিত্রঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উত্তোলিত তালের চারা দিয়ে চর কুকরী-মুকরীতে তালের পরীক্ষামূলক বাগান।

চিত্রঃ ভোলা উপকূলীয় এলাকায় ও চর কুকরী-মুকরীতে খালের পাড়ে তাল গাছের বনায়ন।

উপসংহার

ব্যাপকভাবে তালের বনায়ন করার জন্য নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন করতে হবে। তালগাছের আবাদ বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপকূলীয় এলাকার সরকারি মালিকানাধীন সকল রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, খাস জমি ও পতিত জমিতে তালগাছ রোপণ করা যেতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জমির আইলে, রাস্তারধারে, পুকুরপাড়ে, নদীরপাড়ে পতিত জমিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাল গাছ লাগানো প্রয়োজন। এতে একদিকে দেশের গুড় ও চিনির চাহিদা পূরণে অবদান রাখতে পারবে অন্যদিকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ অন্যান্য স্থানে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে তালগাছ লাগালে ঝড়-ঝঞ্জা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। আর তালগাছ যতদিন থাকবে ততদিন তা আমাদেরকে এর সৌন্দর্য দিয়ে মুগ্ধ করে রাখবে।

যোগাযোগ : বিভাগীয় কর্মকর্তা
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
মুজগুন্নী, খুলনা।
টেলিফোন : +৮৮ ০৪১ ৭৬২৯২৭
ই-মেইল : domsd@bfri.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.bfri.gov.bd

যোগাযোগ : বিভাগীয় কর্মকর্তা
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
রূপাতলী, বরিশাল।
টেলিফোন : +৮৮ ০৪৫১ ৭১৬১৭
ই-মেইল : doptud@bfri.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.bfri.gov.bd